বঙ্গে অলীক কুনাট্যের রঙ্গে মধু-রেণ সমাপয়েৎ

অরিন্দম ঘোষ

দৃপ্ত কৈশোরের সংরাগ। মহাকবি হওয়ার স্বপ্ন। ইংরেজি ভাষায় মহাকবি হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এক বাঙালি কিশোর। ১৭ বছর বয়সে সেই স্বপ্ন চোখে নিয়ে জীবনের প্রথম সুরাপানের উদযাপন করতে কিশোরটি গঙ্গায় বজরা ভাড়া নেয়। সঙ্গে তার জীবনের পরম বন্ধু গৌরদাস বসাক। পানপাত্র থেকে পানীয় গলায় ঢালতে ঢালতে বন্ধুর হাতেও একপাত্র শেরি তুলে দেয় সেই কিশোর। ব্যক্ত করে তার মনের প্রতিশ্রুত বাসনা, আমায় মহাকাব্য লিখতে হবে। হবেই। এবং সেটা ইংরেজি ভাষায়। আমি এই বাংলায় আবদ্ধ থাকতে চাই না। আমাকে পৌঁছতে হবে বিশ্বসংস্কৃতির কাছে। আধুনিক সাহিত্যের দরজা খুলে যাবে আমার লেখায়। পানপাত্র হাতে প্রিয়তম বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে সেই কিশোর গঙ্গাবক্ষে খোলা আকাশের নিচে আবেগবিধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করে ওঠে তারই স্বরচিত কবিতা —

"I sigh for Albion's distant shore,
It's valley's green, it's mountain's high;
To friends, relations, I have name
In that for clime, yet, Oh! I sigh
to cross the vast atlantic wave
For glory, as a nameless grave!"

মুগ্ধ বিস্ময়ে গৌরদাস তাকিয়ে তাঁর প্রিয়তম প্রতিভাবান বন্ধুটির দিকে। তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুটেই বেরিয়ে এল — 'মধু, ইউ আর আনডিনায়েবলি দ্য জুপিটার অ্যামাং দ্য ব্রাইট স্টারস অফ দ্য কলেজ।' সেই সন্ধ্যার গৌরদাস বসাকের উপলব্ধি পরবর্তীকালে বাস্তবে রূপ নিয়ে আমাদের বাঙালি সাহিত্যজীবনে নিয়ে এল এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি, সাহিত্যিক ও নাটককারকে — যাঁর নাম এতক্ষণে পাঠক আপনি অনুধাবন করেছেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

এই লেখা যদিও সামগ্রিক মধুসূদনের সাহিত্যচর্চা নিয়ে নয়, বরং বাংলা নাটককার হিসাবে তাঁর পথিকৃৎ হয়ে ওঠার আলোচনা। যা তাঁর অকালপ্রয়াত জীবনের নানা অসমাপ্ত কর্মের মধ্যে একটা অতীব সম্ভাবনাময় ও উৎকর্ষের অসমাপ্ত অধ্যায়।

সেই কিশোর মধু স্বপ্ন দেখেছিল ইংরেজি ভাষায় মহাকবি হওয়ার। তার আদর্শ মিলটনের মতো। আর সেই প্রথম জীবনের সুতীব্র অভিলাষ ছড়িয়ে পড়েছে প্রিয় বন্ধু গৌরদাসকে লেখা ব্যক্তিগত চিঠিতে — "I

am reading Tom Moore's life of my favourite Byron, a splendid book upon my word! Oh! How should I like to see you writing my life if I happen to be a great poet — which I am almost sure I shall be if I can go to England."

এর পরের বছর পনেরো মধুসূদনের জীবনে রয়েছে নানা ঘটনার বৈচিত্র্যময় সংঘাত। সংঘাত এই কারণেই যে সেই পথ মসৃণ ছিল না মোটেই, বরং বন্ধুর, এবড়োখেবড়ো। জীবন তাঁকে প্রতিমুহূর্তে হোঁচট খাইয়েছে, রক্তপাত ঘটিয়েছে — কিন্তু থামেনি তাঁর কলম। প্রথমে তাঁর গোঁড়া ক্ষমতাবান পিতার বিরোধিতা করে গৃহত্যাগ, খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন, হিন্দু কলেজ থেকে বেরিয়ে বিশপ্‌স্ কলেজ, নাম বদলে মধুসূদন থেকে মাইকেল মধুসূদন, কলকাতার মায়া কাটিয়ে মাদ্রাজ, ছাত্রজীবন থেকে সাংবাদিকের পেশা ও সমান্তরালভাবে কলম চালনা, ইংরেজ মহিলা রেবেকা ম্যাকটাভিসের সঙ্গে প্রণয় ও পরিণয়, সন্তানলাভ এবং আপাতসরব জীবনের মধ্যে নীরবে বিবাহ বিচ্ছেদ। আর তারপরই ফরাসি রমণী আঁরিয়েতের (আমরা বেশিরভাগই উচ্চারণ করি হেনরিয়েটা) সঙ্গে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বিবাহ অথবা মতান্তরে যৌথসহবাস বা লিভ-ইন। এসবই ঘটে গেল সিনেমার মতো। কিন্তু এরই মধ্যে গৌরদাসের সেই জিনিয়াস বন্ধু প্রকাশ করলেন ইংরাজিতে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দ্য ক্যাপটিভ লেডি' । সেটা ১৯৪৯। মাদ্রাজে এই গ্রন্থ প্রভূত সমাদর পেল। যদিও কলকাতায় ততটা প্রচার হয়নি। কিন্তু এই সময়েই একটা ঘটনা ঘটল। 'দ্য ক্যাপটিভ লেডি' পড়ে বেথুন সাহেব মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাসকে একটি চিঠি লিখলেন। যেখানে মধুসূদনের আপাত সাহিত্য সম্ভাবনার প্রশংসা করে তিনি লিখলেন — "he could render far better service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language..."। আসল সত্যিটা যাই হোক না কেন, হয়ত এই চিঠির দৌলতেই মধুসূদনের একটা আত্মোপোলব্ধি হল। কেননা এরপর বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি মধুসূদনের বাংলা ভাষাচর্চা শুরু হল। তিনি বন্ধুকে লিখলেন, "I am losing my Bengali faster than I can mention."। তিনি বাংলায় রামায়ণ-মহাভারত পড়তে শুরু করলেন, প্রামাণ্য হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে গৌরদাসকে লেখা তাঁর চিঠির অংশ — "My life is more busy than that of a schoolboy. Here is my routine : 6-8 Hebrew, 8 to 12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English." এবং তিনি হয়ত নিজেকেই প্রশ্ন করছেন — "Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?" (১৮ই আগস্ট, ১৮৪৯)। এই সময় মধুসূদন অরফ্যান অ্যাসাইলামের শিক্ষক, ইউরেশিয়ান পত্রিকার সম্পাদক এবং কিছুদিন পরেই মাদ্রাজ হিন্দু ক্রনিক্যাল-এরও সম্পাদক। পরে মাদ্রাজের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র মাদ্রাজ স্পেকটেটরের-ও সহ-সম্পাদক। কিন্তু এর সাত বছরের মাথায় মধুসূদন মাদ্রাজ ছেড়ে কলকাতায় পাড়ি দিচ্ছেন। আর এটাই সম্ভবত তাঁর জীবনের আর একটা বাঁক বিন্দু (turning point) যেখানে তিনি বাংলায় লেখা শুরু করবেন। এবং বাংলা নাটকও লিখবেন। ১৮৫৬ সালের শুরুতেই মধুসূদন কলকাতায় ফিরলেন। আর মধুসূদনের এই কলকাতায় ফিরে আসা সমাপতিত হল খানিকটা বাংলা নাটক রচনার ধারা শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই।

মোটামুটি ভাবে বাংলায় মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত ১৮৫২ সন থেকে। এই সময়ে প্রথম কয়েকবছর ইংরাজি ও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব বাংলা নাটকে ভীষণভাবেই দেখা যায়। দেখা যাচ্ছে কখনও ইংরাজি নাটকের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হরচন্দ্র ঘোষ, তারাচরণ শিকদার, জি. সি. গুপ্ত প্রমুখ নাটককার তাঁদের নাটকে পঞ্চমাংক, বিয়োগান্তক ঘটনা, নট-নটি-সূত্রধর-নান্দী চরিত্র বর্জন — এইসব

প্রয়োগ করছেন। আবার অন্যদিকে রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর নাটকের সংস্কৃত নাট্যধারার অনুসারী হয়ে নট-নটি, সূত্রধর, নান্দী প্রভৃতি চরিত্র এনেছেন, সংলাপের সঙ্গে সঙ্গীতের মিশেল ঘটিয়েছেন। এই সময়ে যখন বাংলা নাটক লেখার ধারা ও মান নিয়ে টানাপোড়েন চলছে, তখনই বেলগাছিয়া নাট্যশালার সূত্রে মধুসূদনের বাংলায় নাটক লেখার সূত্রপাত।

সেই সময় কলকাতায় ফিরে মধুসূদন কর্মহীন। বন্ধু গৌরদাস বসাকের সহায়তায় তিনি কলকাতার পুলিশ আদালতে প্রধান কেরানির চাকরি পান। বন্ধুর সঙ্গেই তিনি পাইকপাড়ার রাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সদ্যনির্মিত বেলগাছিয়া নাট্যশালা বা বেলগাছিয়া থিয়েটারে যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় বাংলা ভাষার প্রসিদ্ধ নাটককার রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা সংস্কৃত নাটক ইংরাজিতে অনুবাদের জন্য গৌরদাস মধুসূদনকে অনুরোধ করেন। আসলে রত্নাবলী নাটক প্রতাপ সিংহ ও ঈশ্বর সিংহের তত্ত্বাবধানে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের প্রস্তুতি চলছিল। এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের জীবনচরিত-এ যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখছেন — ''মধুসূদন তখন মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুলিশ আদালতে কার্য্য করিতেছিলেন। 'রত্নাবলী'র ইংরাজী অনুবাদ করা স্থির হইলে, গৌরদাসবাবু তাঁহার উপর এই ভার দিবার প্রস্তাব করিলেন। মধুসূদনের নাম বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতৃগণের অবিদিত ছিল না। হিন্দু কলেজে অধ্যায়নাবস্থা হইতেই ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল; এবং 'ক্যাপটিভ লেডী' হইতে অনেকেই তাঁহার ইংরাজী ভাষার উপর অসাধারণ অধিকারের পরিচয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজারা আহ্লাদের সহিত গৌরদাসবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং মধুসূদনের উপর 'রত্নাবলী'র অনুবাদের ভার অর্পণ করিলেন।" যদিও এই সময় পর্যন্ত মধুসূদনের বাংলা নাটক লেখার কোনও অভিপ্রায় ছিল না। তখনও পর্যন্ত মধুসূদন এক বর্ণও বাংলা সাহিত্য রচনা করেননি। কিন্তু এই অনুবাদ করতে এসে মধুসূদন দত্ত অনুভব করলেন বাংলা নাটকের গুণগত মানের নিদারুণ অবস্থা। তিনি গৌরদাসকে খানিকটা হতাশাগ্রস্ত হয়েই বাংলা নাটকের অনুৎকর্ষতার কথা জানান, এবং সেই সঙ্গে খানিকটা স্বভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্য ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন যে তিনি নিজেই বাংলা থিয়েটারের জন্য নাটক লিখবেন। এবং সেটা মাতৃভাষাতেই। বন্ধুর দক্ষতা সম্বন্ধে সন্ধিহান না হলেও গৌরদাস এই ঘোষণাকে অবিশ্বাসই করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদন প্রকৃত অর্থেই বুঝেছিলেন বাংলা নাটকের সাহিত্যগুণ খুবই সাধারণ স্তরের। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন —

> ''একদিন 'রচনাবলী'র অভিনয়াভ্যাস (মহড়া) দেখিতে দেখিতে মধুসূদন, গৌরদাসবাবুকে বলিলেন, 'দেখ, কি দুঃখের বিষয় এই যে, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য, রাজারা এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন।' গৌরদাসবাবু শুনিয়া বলিলেন, 'নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায় কি? 'বিদ্যাসুন্দরে'র ন্যায় নাটক আমরা অভিনয় করি, ইহা অবশ্যই তোমার ইচ্ছা নয়। ভালো নাটক পাইলে, আমরা 'রত্নাবলী' অভিনয় করিতাম না, কিন্তু ভালো নাটক বাংলা ভাষায় কোথায়?' মধুসূদন বলিলেন, 'ভালো নাটক? আচ্ছা, আমি রচনা করিব।"

আর এই ঘোষণার সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই মধুসূদন বন্ধু গৌরদাসের হাতে তুলে দিলেন বাংলায় লেখা তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম — একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক 'শমিষ্ঠা'। তিনি গৌরদাসকে বললেন এই নাটক প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে উপহারস্বরূপ দিতে। তিনি প্রস্তাবনায় তাঁর মনের কথা ও উপলব্ধি বিবৃত করলেন এইভাবে — ''মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এদেশের যে কি পর্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনাদের দেশহিতৈষীতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্ধারণ করেন ইতি।" আর এই নাটকের প্রস্তাবনা সংগীতে তিনি বাংলা নাটকের হতশ্রী চেহারায় কতটা মর্মপীড়িত সেটা বোঝালেন আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে মিথ হয়ে যাওয়া

সেই লাইনগুলো দিয়ে —

''কোথা বাল্মিকী ব্যাস কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু, মন ক্ষয়।
মধু কহে জাগো মাগো, বিভুস্থানে এই মাগো,
সুরসে প্রবৃত্ত হক্ তব তনয়-নিচয়।''

'দ্য ক্যাপটিভ লেডি' পড়ে শিক্ষাবিদ ড্রিংকওয়াটার বেথুন তরুণ সাহিত্যপ্রতিভা মধুর নিজের মাতৃভাষাতেও যে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনার দূরদর্শিতা ব্যক্ত করেছিলেন তা অচিরেই পূর্ণতা পেল 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের সৃষ্টিতে। বেথুন যে ইঙ্গিত করেছিলেন, ইংরাজি সাহিত্যে আর একজন বায়রণ, বা শেলী না হয়ে বাংলা সাহিত্যে একজন অনুরূপ বায়রণ বা শেলী আসুক, সেই উপলব্ধির প্রথম ধাপ অবশ্যই 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া থিয়েটারে 'শর্মিষ্ঠা' প্রথম অভিনয় হল। পরবর্তীকালে এই নাটক পাইকপাড়ার রাজার অর্থানুকূল্যে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের বিষয়বস্তু মহাভারতের আদিপর্বে যযাতি ও দেবযানীর আখ্যানের ওপর নির্ভর করে লেখা হল।

'শর্মিষ্ঠা' লেখার পর নাটকটির বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও চলনে কোনও ভুলভ্রান্তি আছে কিনা তা দেখার জন্য মধুসূদন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে পড়তে দিয়েছিলেন। তর্কবাগীশ পড়ে বলেছিলেন, ''দাগ দিতে গেলে কিছু থাকবে না। তবে আমরা পৃথিবী থেকে চলে গেলে তোমার বইয়ের খুব কদর হবে।'' আবার রামনারায়ণ তর্করত্নকে মধুসূদন অনুরোধ করেন নাটকের ব্যাকরণগত ভুলভ্রান্তি দেখে দেওয়ার জন্য। রামনারায়ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন সংস্কৃত নাটক অনুকরণ করে লেখার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই মধুসূদন এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করেননি।

'শর্মিষ্ঠা' নাটক লিখে মধুসূদন শুধু প্রথম উৎকৃষ্ট বাংলা নাটকই লিখলেন না, এই প্রথম বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যেরও সূচনা করলেন। আজকের যুগে এগিয়ে এসে যখন দেখি নাটক সাহিত্যের পদবাচ্য হচ্ছে, বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কিংবা ব্রাত্য বসুর 'মীরজাফর' নাটক সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য সম্মান অর্জন করছে, তখন মনে হয় নাটক যে সাহিত্যের অন্যতম শিল্প উপাদান হতে পারে তার প্রথম বীজ বপন করেছিলেন মধুসূদন-ই। 'শর্মিষ্ঠা'র প্রযোজনাসাফল্য মধুসূদনকে বাংলা নাটক লিখতে প্রবল আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তিনি অনুভব করেন শুধু সাহিত্য নয়, থিয়েটারে প্রযোজনার স্বার্থে, দর্শককে ভাল নাট্য দেখানোর জন্য তাঁর নাটক লেখার প্রয়োজন।

মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় 'শর্মিষ্ঠা'র বিস্তারিত আলোচনা করে লিখেছিলেন, ''বাঙালি নাট্যকারে ও দত্তজায় এই বিশেষ প্রভেদ যে, পূর্বোক্তরা অভিনয়ে কি প্রকার বাক্যে কি প্রকার ফলোৎপত্তি হইবে তাহার বিবেচনা না করিয়া নাটক রচনা করেন। দত্তজা তাহার বিপরীতে অভিনয়ে কি প্রয়োজন, কি উপায়ে অভিনেয় বস্তু সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত লইবে; এবং কোন প্রণালীর অবলম্বনে নাটক

দর্শকদিগের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবেক ইহা বিশেষ বিবেচনাপূর্বক শর্মিষ্ঠা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

এই 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা ছিল মধুসূদনের বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টির বাঁক-বিন্দু, পরিভাষায় যাকে বলে টার্নিং পয়েন্ট। ভাল থিয়েটারের জন্য ভাল নাটক দরকার এই বোধ প্রথম পরিলক্ষিত হল মধুসূদনের কলমে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর প্রথম অভিনয়ের পর ওই সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই 'শর্মিষ্ঠা'র পাঁচটি অভিনয় হয়। 'শর্মিষ্ঠা'র এই সাফল্যপূর্ণ প্রযোজনা মধুসূদনকে যেমন উচ্ছ্বসিত করেছিল, তেমনি তিনি বাংলায় নাটক লেখার আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলেন। সেই আত্মবিশ্বাসে ভর করে তিনি পাইকপাড়ার রাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে পরপর দুটি প্রহসন নাটক রচনা করেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। যদিও রাজার এই অনুরোধ এবং মধুসূদনের পূর্ণাঙ্গ নাটক ছেড়ে প্রহসন লেখার অভিপ্রায়ের পেছনে একটা কারণ আছে। এই সময়ের বাংলায় বিভিন্ন নাট্যশালার মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা, জমিদার বা সমাজের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু এই তথাকথিত শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীর থিয়েটারের সমান্তরালে সমাজের নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে অতীব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বটতলার সাহিত্য আশ্রিত বহু প্রহসন। যে প্রহসনের মূল বিষয়বস্তু ছিল ইংরেজ প্রভাবিত কলকাতার বাবুসমাজের যৌনগন্ধী কেচ্ছা ও সামাজিক অধঃপতনের খুল্লমখুল্লা প্রতিচ্ছবি। সেই প্রহসন-আশ্রিত কিছু নাট্য বটতলার নিম্নবর্গীয় অবস্থান ছেড়ে অভিনীত হতে লাগল অভিজাত থিয়েটারেও। বলা ভাল যে এই প্রহসনগুলির তুমুল জনপ্রিয়তাই উচ্চকোটির পৃষ্ঠপোষকদের এই প্রহসন মঞ্চস্থ করতে কতকটা বাধ্য করেছিল। তাই পাইকপাড়ার রাজা আর প্রথমনাট্যসাফল্য-অনুপ্রাণিত মধুসূদন দুজনেই একমত হলেন প্রহসন মঞ্চস্থ করার বিষয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল প্রহসন দুটি লেখা হওয়ার পরে যতীন্দ্রমোহন পিছিয়ে গেলেন। অর্থাৎ এই প্রহসন দুটি মঞ্চস্থ করার প্রতিশ্রুতি তিনি ভঙ্গ করলেন। এর পেছনে কারণ এই যে 'একেই কি বলে সভ্যতা' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক কুপ্রভাবের বশবর্তী হয়ে বিত্তশালী ঘরের শিক্ষিত নব্যসমাজের স্বাধীনতা উপভোগের নামে সুরাপান, নানা বেলেল্লাপনা ও সর্বোপরি নিয়মিত বারাঙ্গনা সংসর্গের নতুন সংস্কৃতি। তাই এই ধরনের নাটক অভিনয় করা পাইকপাড়ার রাজাদের কাছে নিজেদের সর্বসমক্ষে নগ্ন করার সামিল ছিল। স্বভাবতই সেই ঝুঁকি তারা নেননি। অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রহসন 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ছিল অভিনয়ের জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা এই প্রহসনে মধুসূদন সরাসরি জমিদার শ্রেণীর তঞ্চকতা ও ভণ্ডামি এবং তাঁদের সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীদের সম্ভোগ করার বিকৃত কামপ্রবৃত্তির চেহারা দেখালেন। স্বভাবতই জমিদারদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি মঞ্চে এই নাটকের অভিনয় হওয়া বাস্তবিকই উলটপুরাণ হয়ে যেত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রচনা হওয়ার সময় 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের নাম ছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির'। যে শিবমন্দিরে জমিদার ভক্তপ্রসাদ তাঁর প্রজা হানিফের সুন্দরী স্ত্রী ফাতেমাকে ভোগ করার কু-কৌশল ফেঁদেছিল। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় নাম পরিবর্তন হয়। বেলগাছিয়া থিয়েটারে এই দুটো প্রহসন মঞ্চস্থ না হলেও ১৮৬০ সালে পুস্তক হয়ে প্রকাশিত হয় যার প্রকাশক ছিলেন বেলগাছিয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। এর বছর পাঁচেকের মাথায় ১৮৬৫ সনের ১৮ জুলাই শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি মঞ্চস্থ করে 'একেই কি বলে সভ্যতা'। আর তার পরের বছর ১৮৬৬ সালে আরপুলি নাট্যসমাজ মঞ্চস্থ করে 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের উৎকর্ষ হল এই যে, তৎকালীন বঙ্গ সমাজকে মধুসূদন যে চোখে দেখেছেন, সেই অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রয়োগ। সেই সময়ের 'নব্যবাবু' বা 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের চরিত্রের যে স্খলন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন এই প্রহসনে। এমন সমাজবাস্তবধর্মী প্রহসন রচনা করে তিনি পাঠক সমাজের প্রশংসার্হ হলেও বিরাগভাজন হলেন ওই ইয়ংবেঙ্গলের। হয়ত

সে কারণেই পাইকপাড়ার রাজা এই প্রহসন মঞ্চস্থ হওয়া থেকে বিরত হন, যা আগেই আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে এই প্রহসন রচনার অব্যবহিত পরেই মধুসূদন 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রেঁ' রচনা করেন। এই প্রহসনে সমাজের আরও এক বিপরীতমুখী বাস্তব চরিত্র ও তার অন্ধকার দিকটা সরাসরি তুলে আনেন মধুসূদন। বুড়ো বয়সে ক্ষমতাবান বৃদ্ধ জমিদারের ইন্দ্রিয়াসক্তির দৌরাত্ম্য ও লাম্পট্যের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন এ প্রহসনের মূল উপজীব্য। 'একেই কি বলে সভ্যতা'-তে মধুসূদন যেমন শহরের নাগরিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণু সমাজচিত্র এঁকেছেন, তেমনি 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে গ্রামীণ সমাজের জোতদার শোষিত সামাজিক অসঙ্গতি ও মানুষের মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়কে তিনি সরাসরি তুলে ধরেছেন। সৃষ্টিশীলতার প্রয়োগবৈচিত্র্যে দ্বিতীয় প্রহসনে চরিত্রসৃষ্টি ও তার সংলাপের সরসতা ও তীক্ষ্ণতা দর্শককে মজিয়ে দেয়। 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে সরল অথচ চমকপ্রদ সংলাপের পাশাপাশি কবিতা বা ছড়া ব্যবহার করে নাট্যভাষাকে আরও সরস ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন মধুসূদন দত্ত। যদিও সমালোচক দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণে এই প্রহসনে ফরাসি নাটককার মলিয়েরের 'তার্ত্যুফ' নাটকের প্রভাব রয়েছে। মূল কাহিনিতে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও মধুসূদনের এই প্রহসন সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ, যেখানে কোনও কৃত্রিমতা নেই। আর যে কথা আগেই উল্লিখিত, এই প্রহসনের ভাষা ও বিন্যাসকৌশলে মধুসূদনের দৃষ্টিভঙ্গি ও কলমের স্বাতন্ত্রবোধ পরিষ্কার বোঝা যায়। মধুসূদন এই দুটি মাত্রই প্রহসন লিখেছেন এবং দুটি প্রহসনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক ও বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম বলছেন, ''প্রহসন-সৃষ্টির শিল্পপ্রতিভা সম্পর্কে মাইকেলের প্রতিভা ছিল যুগাগ্রগামী; একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা চলে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রতিটি চরিত্রকে তিনি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করে তাতে স্বকীয়তা আরোপ করেছেন।" যদিও একথা বলা মোটেই বাহুল্য হবে না যে, মলিয়েরের সঙ্গে মাইকেলের প্রহসনের সাদৃশ্য থাকুক বা না থাকুক, মলিয়েরের মতোই মধুসূদনের জীবদ্দশাতে তাঁর সৃষ্টির উপযুক্ত পুরস্কার মেলেনি।

এই দুটি প্রহসন রচনার পরপরই মধুসূদন তাঁর দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখেন — 'পদ্মাবতী'। ১৮৬০ সালে। এই নাটক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের জন্য। সেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার। গ্রিক পুরাণের আখ্যান 'অ্যাপল অফ ডিসকর্ড'-এর ছায়া অবলম্বনে মধুসূদন 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। যদিও এই নাটক অভিনয়ে আগ্রহ দেখায়নি তৎকালীন কোনও নাট্যশালা। সম্ভবত অমিত্রাক্ষর ছন্দের সংলাপ আত্মস্থ করার মতো দক্ষতা বা আত্মবিশ্বাসের অভাব হয়ে থাকবে তৎকালীন অভিনেতাদের। তবু 'পদ্মাবতী' সাহিত্য বা নাটকের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে ওই অমিত্রাক্ষর ছন্দের পথ-প্রদর্শক হয়ে। এর পরের বছর ১৮৬১-তে মধুসূদন রচনা করলেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। এটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক। মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীর কাহিনি সূত্র নিয়েছিলেন কর্নেল টডের বিখ্যাত বই 'এনাল্‌স্ এন্ড এনটিক্‌স্ অফ রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে। বলা যেতে পারে এই নাটক এক সার্থক ঐতিহাসিক ট্রাজেডি। রানা ভীমসিংহের কুমারী কন্যা কৃষ্ণার পিতাকে দারুণ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য রাজ্যের কল্যাণের স্বার্থে স্বেচ্ছায় আত্মবলিদানের কাহিনি। বেশিরভাগ নাট্য ও সাহিত্য সমালোচক মধুসূদনের এই নাটককে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট নাটক বলছেন। 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন — ''রচনা, গ্রন্থনা, ঘটনাসংঘাত ও সংলাপের দিক দিয়ে এ নাটক মাইকেলের নাট্যপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করছে, বাংলা নাটকের ইতিহাসেও এর স্থান খুব উচ্চে।" আসলে এই নাটকে বাংলা সাহিত্যের চিরাচরিত বীরগাথার জনপ্রিয়তাকে গ্রাহ্য না করে মধুসূদন তার বিপরীতমুখী ধারার প্রবর্তন করলেন। ঠিক যেমনটি তিনি করেছিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্যে' — রামের বীরত্বকে পেছনে রেখে মেঘনাদের জয়গান ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে

মুসলমান-বিরোধী রাজপুতদের প্রচলিত বীরগাথার বিপরীত অবস্থানে তিনি তুলে আনলেন তৎকালীন রাজপুত রাজন্যবর্গের অন্তরকলহ, শঠতা, বিদ্বেষ ও পারস্পরিক শত্রুতা ও অন্তর্ঘাতের কাহিনি। এক নারীকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে রেখে তাঁকে করায়ত্ত করার যে নিকৃষ্ট কলহ তার স্বরূপ উন্মোচন করলেন মধুসূদন।

বেলগাছিয়া থিয়েটারে নাটককার হিসেবে যুক্ত থাকার সময় প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাক ও সেই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক মধুসূদন কেশবচন্দ্রকেই উৎসর্গ করেছিলেন) লেখা নানা চিঠিপত্রে মধুসূদনের নাট্যসৃজনের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। অভিজাত জমিদারের বাগানবাড়ির অঙ্গন থেকে বাংলা থিয়েটারকে উদ্ধার করে যথার্থ গণতান্ত্রিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করার অভিলাষ মধুসূদনের ছিল। তাই তাঁর প্রায় সব নাটক বা প্রহসনেই প্রাচীন সামন্ততন্ত্র লালিত যে সামাজিক বন্দোবস্ত তার অন্ধকার ও অমানবিক দিকটা তুলে ধরাই মধুসূদনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। মধুসূদন রচিত দুটি প্রহসনের আলোচনায় যে প্রসঙ্গ প্রাগুক্ত। যেমন, 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে মানবিক অধিকারে বঞ্চিত শর্মিষ্ঠা কেন্দ্রীয় চরিত্র হন, তেমনই 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকেরও কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজপুত-রাজাদের ঈর্ষাপরায়ণতা ও লোলুপতার শিকার হয়ে যে সামাজিক ও মানসিক বিপন্নতার মুখোমুখি হন, সেই দিকটাই বিবৃত হয়েছে নাটকে। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রসঙ্গ আগেই উল্লিখিত। সেখানেও পৌরাণিক বীরগাথার আবেগমথিত কাহিনির বিপরীতে জন্মভূমি রক্ষার্থে দেশপ্রেমের বিষয়টাই মুখ্য হয়ে ওঠে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' নাটক আকারে না লিখলেও মেঘনাদ ও বিভীষণের পারস্পরিক সংলাপ এক অভূতপূর্ব নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করে, উচ্চারিত হয় দেশপ্রেমের সংলাপ, 'জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?' এটা উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না যে, পরবর্তীতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' নাটক আকারে মঞ্চস্থ হয় বেঙ্গল থিয়েটারে। প্রথম অভিনয় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ। প্রমীলার চরিত্রে অভিনয় করেন বিনোদিনী দাসী বা নটী বিনোদিনী। তিন দশক আগে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সফলভাবে মঞ্চস্থ করেছে 'নান্দীকার', পরবর্তীকালে 'নয়ে নাটুয়া' । একক অভিনয়ে মঞ্চ মাতিয়েছেন গৌতম হালদার।

ফিরে আসি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রসঙ্গে। এই নাটকে অহল্যা, তপস্বিনী, ধনদাস ইতিহাস আশ্রিত নয়। ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, ''মধুসূদন কয়েকটি চরিত্রের নামের পরিবর্তন করেছেন। যেমন মহারাজা জোয়ানদাস হয়েছেন বলেন্দ্রসিংহ, কর্পূর মঞ্জরীকে করেছেন বিলাসবতী, মন্ত্রী সতীদাস হয়েছেন সত্যদাস ইত্যাদি। আর এর সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছেন কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র যেমন মদনিকা, ধনদাস, তপস্বিনী প্রভৃতি।" এক্ষেত্রে মধুসূদন তাঁর সৃজনী চিন্তার প্রয়োগে কাহিনির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার গতিময়তার সঙ্গে ঐতিহাসিক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে মত প্রকাশ করে লিখেছিলেন — ''রসের সৃজনটাই উদ্দেশ্য, অতএব সেজন্য ঐতিহাসিক উপকরণ যে পরিমাণে যতটুকু সাহায্য করে সে পরিমাণে ততটুকু লইতে কবি কুণ্ঠিত হন না।" সুতরাং লেখকের কাজ যেমন ইতিহাসের অন্ধ অনুসরণ নয় মাইকেলও তেমনি কর্নেল টডের ইতিহাসকে বিস্তৃত রূপদান করে ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি দিতে চাননি। কারণ নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি ইতিহাসবোধ অপেক্ষা নাট্য সম্ভাবনার ট্র্যাজিক শৈলীর প্রতি অধিক যত্নশীল ছিলেন। এর কারণ অবশ্যই নাট্যশালার প্রত্যক্ষ প্রভাব। শুধু সাহিত্যচর্চার জন্য নাটকচর্চা নয়, থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার জন্য নাটকের যে যে গুণাবলী প্রয়োজন, তার সম্পর্কে মধুসূদন বিশেষ সচেতন ছিলেন। এবং সেই ভাবনার অনুবর্তী হয়ে মধুসূদন বহুক্ষেত্রেই মৌলিকতার পরিচয় রেখেছেন। ডঃ সুকুমার সেন বাংলা নাটকের এই পর্বের নাটক সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলছেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক হিসাবে সার্থক। বলছেন, ''কৃষ্ণকুমারী — নাটকের মূল কথা হইতেছে ধনলোভী কপট পুরুষের প্রতি নারীর প্রতিহিংসা এবং তাহার ফলে এক

নিরপরাধ তরুণীর আত্মাহুতি।...কৃষ্ণকুমারী পূর্ববর্তী বাঙ্গালা নাট্যরচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরবর্তী অধিকাংশ নাটকের তুলনায়ও ভালো।" মধুসূদন দত্তের প্রাগুক্ত জীবনীকার এই প্রসঙ্গে লিখছেন, ''কৃষ্ণকুমারী বাংলা ভাষার প্রথম বিষাদান্ত নাটক। 'নীলদর্পণ' ইহার অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষাদান্ত নাটকের অভিনয়-দর্শন ক্লেশকর ও নিষ্ঠুরতার পরিচয়ক বলিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তাহার রচনা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদন কোন নিষেধবিধির দ্বারা পরিচালিত হইবার পাত্র ছিলেন না; তিনি পাশ্চাত্যরীতি অনুসারে তাঁহার নাটক বিষাদান্ত করিয়া রচনা করিয়াছিলেন।" এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে মধুসূদনের আগ্রহ। তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' থেকেই পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শের অনুসরণ আমরা দেখতে পাই। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২), কিংবা জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) প্রভৃতি কয়েকটি নাটকে এই পাশ্চাত্য প্রভাব দেখা গেলেও মধুসূদন দত্তের নাটকেই পাশ্চাত্য আদর্শের সফল প্রয়োগ হয়েছে। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখছেন, ''সংস্কৃত রীতি ভিন্ন অন্য কোন রীতিতে যে নাটক রচনা হইতে পারে, অনেকের সেরূপ ধারণা পর্য্যন্ত ছিল না। মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা'য় কিয়ৎপরিমাণে, ইংরাজী রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন।" নাটককার মধুসূদন দত্তের এই দূরদর্শী প্রয়াস পরবর্তীকালে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে বললে হয়ত অতিশয়োক্তি হবে না।

মধুসূদন যে শুধুমাত্র বাংলা মঞ্চের জন্য উৎকৃষ্ট নাটক লিখেছেন তাই নয়, তিনি বাংলা থিয়েটারের সেই শুরুর দিনে থিয়েটার পরিচালনায় আধুনিকতা বা অন্যান্য সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে মধুসূদন থিয়েটার বিষয়টাতেই প্রবল আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মূল অভিপ্রায় ছিল কীভাবে বাংলা নাটকের মান বাড়ানো যায় এবং থিয়েটারকে আধুনিকতার স্পর্শ দিয়ে যুগোপযোগী করে তোলা যায়। ধনাঢ্য জমিদারদের বাগানবাড়ির প্রাইভেট থিয়েটার ছেড়ে বাংলা থিয়েটার সর্বসাধারণের জন্য দুয়ার খুলে দিল ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। টিকিট বিক্রি করে ও সেই টিকিট কিনে সাধারণ মানুষের বাংলা থিয়েটার দেখার শুরুয়াত সেই দিন। পরের বছরের গোড়ার দিকে ধনবান আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ৯ নম্বর বিডন স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠা করলেন কলকাতার প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা 'বেঙ্গল থিয়েটার'। সুচারুভাবে থিয়েটার পরিচালনা করার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হল, যেখানে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে থাকলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখেরা। শরৎচন্দ্র মাইকেলকে অনুরোধ করলেন তাঁর বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য নাটক লিখে দিতে। কিন্তু তার জন্য তিনি শর্ত আরোপ করলেন যে নাটকের স্ত্রী চরিত্রগুলো মহিলা অভিনেত্রীদের দিয়েই অভিনয় করাতে হবে। এযাবৎকাল বাংলা থিয়েটারে পুরুষ অভিনেতারাই বরাবর নারী চরিত্রে অভিনয় করে এসেছেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের মঞ্চসফল নাটক 'নীলদর্পণ'-এ পুরুষ অভিনেতারাই নারী চরিত্রে রূপদান করেছিলেন। থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগের প্রস্তাবে বেঙ্গল থিয়েটারের উপদেষ্টা কমিটির সভায় বিদ্যাসাগর প্রবল বিরোধিতা করলেন। সেই বিদ্যাসাগর যিনি প্রবল পরাক্রমী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়ন, স্ত্রী-শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু পরম সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী বিদ্যাসাগরের প্রবল বিরোধিতা করলেন অনড় মধুসূদন। উপদেষ্টা কমিটির সভায় মধুসূদনের আনা স্ত্রী-অভিনেত্রী নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু এই যুগান্তকারী প্রস্তাবে যারপরনাই বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উপদেষ্টা কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের মতোই তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ, থিয়েটারে মেয়েরা অভিনয় করবেন এবং সেই মেয়েদের সিংহভাগই আসবেন পতিতালয় থেকে, এই নিষ্ঠুর সত্য মেনে নিতে পারেনি। কেননা সেই সময়ে সমাজে মেয়েদের প্রকাশ্যে গান গাওয়াও

নিষিদ্ধ ছিল। মেয়েরা তো কোন ছার, সমাজে পুরুষ অভিনেতাদেরও সম্মান দিয়ে দেখা হত না। এইরকম সামাজিক পরিস্থিতিতে থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করা মধুসূদনের অগ্রবর্তী মানসিকতার পরিচয় দেয়। বহুদিন আগে লেবেদিয়েফের থিয়েটারে গণিকাপল্লী থেকে অভিনেত্রী নেওয়া হয়েছিল। সেটা ১৭৯৫ সাল এবং সে থিয়েটারে সাধারণ দর্শকের জায়গা ছিল না। তারপর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে যে অন্তরঙ্গ থিয়েটার হয় সেখানেও স্ত্রী চরিত্রে কয়েকজন বারাঙ্গনা নারীকে নেওয়া হয়। তবে সে থিয়েটারও শুধুমাত্র আমন্ত্রিতদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। এই বিক্ষিপ্ত ইতিহাসের অসমাপ্ত বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ করলেন মধুসূদন ও বেঙ্গল থিয়েটার, সমাজপতিদের ভ্রূকুটি ও সমালোচনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সুদূরপ্রসারী এক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়ে। বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত কেন সেটা অমৃতবাজার পত্রিকার সমালোচনা পড়লেই বোঝা যায়, ''রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হইলে অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। কিন্তু এই স্ত্রীলোকের অংশসকল সমাজপরিত্যক্তা ধর্মভ্রষ্টা স্ত্রীলোকদিকের দ্বারা অভিনীত হইলে জনসমাজে পাপ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি হয় কিনা তা পরীক্ষাসাপেক্ষ। 'বেঙ্গল থিয়েটার' কোম্পানি এই দুরূহ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নাটকাভিনয়ে উন্নতি করিতে গিয়া যদি সমাজের একজন লোককেও আমাদের পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে সে ক্ষতির আর পূরণ করা হইবে না।''

যাইহোক, শরৎচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে মাইকেল স্ত্রীচরিত্রে মহিলা অভিনেত্রী নিয়োগের শর্তে যে দুটো নাটক লিখতে আরম্ভ করেন, তার একটি হল 'মায়াকানন', আর অন্যটি 'বিষ না ধনুর্গুণ'। সেই সময় মধুসূদন খুবই অসুস্থ। প্রায় মৃত্যুশয্যায়। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে মধুসূদন শেষ করেন 'মায়াকানন' লেখা। 'বিষ না ধনুর্গুণ' তখনও অসমাপ্ত। কিন্তু এর দ্বিমতও আছে। অনেক তাত্ত্বিকই মত পোষণ করেন যে 'মায়াকানন' মধুসূদন শেষ করতে পারেননি। সম্ভবত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সহ-সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাটকটির অসমাপ্ত অংশ শেষ করেছিলেন। সেই কারণেই শরৎচন্দ্র তাঁর থিয়েটারের উদ্বোধনী নাট্য 'মায়াকানন' না করে পুরনো নাটক 'শর্মিষ্ঠা' দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের যাত্রা শুরু করেন। সেদিনটা ছিল ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট। আর মাইকেল চলে যাচ্ছেন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন — মাস দেড়েক আগে। তিনি তাঁর শেষ নাটক মঞ্চস্থ হওয়া দেখে যেতে যদিও পারলেন না, কিন্তু তাঁর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেনি 'বেঙ্গল থিয়েটার'। শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম প্রযোজনা 'শর্মিষ্ঠা'র প্রথম রজনী উৎসর্গ করলেন মাইকেল-কে। আর সেদিনই সাধারণ রঙ্গালয়ে বা পেশাদার থিয়েটারে স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করলেন দুই মহিলা অভিনেত্রী। ২২ আগস্ট 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকা লিখল — ''আজিকালি কলিকাতায় বড় নাটকের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। একদল সাতুবাবুর বাড়ির সম্মুখে একটি নাট্যশালা নির্মাণ করিয়াছেন। গত শনিবার তথায় মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রণীত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতাদিগের মধ্যে দুইজন বেশ্যাও ছিল। এ পর্য্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্রসন্তানেরা আপনাদিগের মর্যাদা আপনারা রক্ষা করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।'' কিন্তু এসব সত্ত্বেও মধুসূদনের কাঙ্ক্ষিত পথ থেকে পিছিয়ে আসেনি বেঙ্গল থিয়েটার। আমরা দেখতে পাই, এর পরের বছরই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনেত্রী হিসেবে যোগ দিলেন সমাজের চোখে অচ্ছুৎ পাঁচ নারী। রাজকুমারী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী আর কাদম্বিনী। রক্ষণশীল বাঙালি সমাজ মুখে 'বয়কট'-এর ধুয়ো তুললেও থিয়েটারের টিকিট বিক্রির অঙ্ক কিন্তু অন্য কথা বলল। বাঙালির দ্বিমুখী অবস্থানকে বেপর্দা করে বাংলা থিয়েটারে টিকে গেলেন গোলাপ, এলোকেশীরা।

মাইকেলের দূরদর্শী শর্ত আর বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহসের

কারণেই বাংলা থিয়েটারে নতুন যুগ এল। গোলাপ, এলোকেশীদের পথ ধরে একে একে এলেন প্রমদাসুন্দরী, বিনোদিনী, তিনকড়ি — আরও অনেকে। অপমান, লাঞ্ছনার যে অন্ধকার আবর্ত, সেই জীবন পেরিয়ে বেঁচে থাকার নতুন রসদ খুঁজে পেলেন সমাজের তথাকথিত ব্রাত্য নারীরা। এই লেখা যখন লিখছি তখন এক আশ্চর্য সমাপতন। পেশাদার রঙ্গালয়ের ১৫০ বছর। বাংলা সাধারণ থিয়েটারে প্রথম মহিলা অভিনেত্রীদের বরণ করে নেওয়ারও ১৫০ বছর। আর ঘটনাচক্রে এ-বছরেই ২০০ বছরে পা রাখলেন মধু-কবি মাইকেল। এই আধুনিক সময়েও তিনি ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। তার কারণটাও তিনি নিজেই প্রিয় বন্ধুকে লিখেছেন, ''আমি মিলটনের কাছে অনেক কিছু শিখেছি, ধার করেছি। কিন্তু তবু আমি অরিজিনাল, পার্থক্যটা নিশ্চয়ই মানুষের চোখে পড়বে। Milton elevates the mind to a most astonishing height, but never touches the heart — আমি কিন্তু বাঙালির হৃদয় স্পর্শ করেছি। বাঙালি আমাকে মহাকবির আসন দেবেই দেবে। আমাকে ভুলবে না কোনওদিন।''

তথ্যসূত্র :

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী
উনিশ শতকের নাট্যবিষয় - দর্শন চৌধুরী
বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান - শংকর ভট্টাচার্য
মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত - যোগীন্দ্রনাথ বসু
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ - শিবনাথ শাস্ত্রী
বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা - ডঃ বৈদ্যনাথ শীল
কলকাতার নাটমঞ্চ : বাংলার নাট্যকথা - সলিল সরকার
বাংলা নাটকের বিবর্তন - সুরেশচন্দ্র মৈত্র
বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ - মন্মথমোহন বসু
নট নাট্য নাটক - সুকুমার সেন

অরিন্দম ঘোষ : প্রাবন্ধিক ও অভিনেতা। রচনা করেছেন নাট্য বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ।